অপরাজিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

অপরাজিত

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদের ভিড় এখনও ভাঙে নাই। বীরু মুহুরীর উপর ভিখারীর চাউল দিবার ভার আছে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে পর্যন্ত অনেকে সন্দেহ করে যে, জমাদার শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতিবারই বঞ্চিত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব কোনকালেই মেটে নাই। শেষ পর্যন্ত দারোয়ানেরা রাগিয়া ওঠে, রামনিহোরী সিং দু-চারজনকে গলাধাক্কা দিতে যায়। তখন হয় বুড়ো খাজাঞ্চি মহাশয়, নয়তো গিরিশ গোমস্তা আসিয়া ব্যাপরটা মিটাইয়া দেয়। প্রায় কোন রবিবারই ভিখারী বিদায় ব্যাপারটা বিনা গোলমালে নিষ্পন্ন হয় না।

রান্না-বাড়িতে কি একটা লইয়া এতক্ষণ রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল। রাঁধুনী বাম্‌নী মোক্ষদা থালায় নিজের ভাত সাজাইয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়াতে সেখানকার গোলমালও একটু কমিল। রাঁধুনীদের মধ্যে সর্বজয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত কম—বড়লোকের বাড়ি—শহর-বাজার জায়গা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ইহাদের এসব কথাবার্তায় সে বড় একটা থাকে না। তবুও মোক্ষদা বাম্‌নী তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সদু-ঝিয়ের কি অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। যখন যে দলে থাকে, তখন সে দলের মন যোগাইয়া কথা বলাটা সর্বজয়ার একটা অভ্যাস, এজন্য তাহার উপর কাহারও রাগ নাই। মোক্ষদা সরিয়া পড়ার পর সর্বজয়াও নিজের ভাত বাড়িয়া লইয়া তাহার থাকিবার ছোট ঘরটাতে ফিরিল। এ বাড়িতে প্রথম আসিয়া বছর-দুই ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত, এ ঘরটা সেটা নয়; তাহারই সাম্‌নাসামনি পশ্চিমের বারান্দায় কোণের ঘরটাতে সে এখন থাকে — সেই রকমই অন্ধকার, সেই ধরনেরই স্যাঁতসেঁতে মেজে, তবে সে ঘরটার মত ইহার পাশে আস্তাবল নাই, এই একটু সুবিধার কথা।

সর্বজয়া তখনও ভাল করিয়া ভাতের থালা ঘরের মেজেতে নামায় নাই, এমন সময় সদু-ঝি অগ্নিমূর্তি হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

— বলি, মুখি বাম্‌নি কী পর্‌চেয় দিচ্ছিল তোমার কাছে শুনি? বদমায়েশ মাগী কোথাকার, আমার নামে যখন-তখন যার-তার কাছে লাগিয়ে করবে কি জিগ্যেস করি? ব'লে দেয় যেন বড় বৌরানীর কাছে — যায় যেন বলতে — তুমিও দেখে নি'ও বলে

দিচ্ছি বাছা, আমি যদি গিন্নিমার কাছে ব'লে ওকে এ বাড়ি থেকে না তাড়াই তবে আমি রামনিধি ভড়ের মেয়ে নই—নই—নই — এই তোমায় বলে দিলুম।

সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল, না সদু-মাসী, সে বললেই অমনি আমি শুন্‌বো কেন? তা ছাড়া ওর স্বভাব তো জানো — ওই রকম, ওর মনে কোনো রাগ নেই, মুখে হাউ-হাউ ক'রে বকে—এমন তো কিছু বলেও নি—আর তা ছাড়া আমি আজ দু'মাস দশ-মাস তো নয়, তোমায় দেখচি আজ তিন বছর—বল্‌লেই কি আর আমি শুনি? তিন বচ্ছর এ বাড়িতে ঢুকিচি, কৈ তোমার নামে—

সদু-ঝি একটু নরম হইয়া বলিল, অপু কোথায়, দেখচি নে—আজ তো রবিবার—ইস্কুল তো আজ বন্দ—

সর্বজয়া প্রতিদিন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া তবে স্নান করে, তেলের বাটিতে বোতল হইতে নারিকেল তৈল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কোথায় বেরিয়েচে। ওই শেঠেদের বাড়ির পাশে কোন এক বন্ধুর বাড়ি, সেখানে ছুটির দিন যায় বেড়াতে। তাই বুঝি বেরিয়েচে। ছেলে তো নয়, একটা পাগল—দুপুর রোদ্দুর রোজ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চাই তার। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না মাসী!

সদু বলিল, না তুমি খাও, আর বসবো না—ভাবলুম, যাই কথাটা গিয়ে শুনে আসি, তাই এলুম। বোলো ওবেলা মুখি বাম্‌নীকে, একটু বুঝিয়ে দিও—খোকাবাবুর ভাতে সেই দইয়ের হাঁড়ি বৈ-করা মনে নেই বুঝি? সদুর পেটে অনেক কথা আছে, বুঝলে? দেখতেই ভালমানুষটি বোলো বুঝিয়ে—

সদু-ঝি চলিয়া গেলে সর্বজয়া তেল মাখিতে বসিল। একটু পরে দোরের কাছে পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ওঃ, রোদ্দুরে ঘুরে তোর মুখ যে একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে! বোস্ বোস্—আয়—ওমা আমার কি হবে।

অপু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাত-পাখাখানা সজোরে নাড়িয়া মিনিটখানেক বাতাস খাইয়া লইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখনও নাও নি? বেলা তো দুটো—

সর্বজয়া বলিল, ভাত খাবি দুটো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

— খা না দুটোখানি? ভাল ছানার ডালনা আছে, সকালে শুধু তো ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে গিইচিস্? ক্ষিদে পেয়েচে আবার এতক্ষণ—

অপু বলিল, দেখি কেমন?

পরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেজেতে ভাতের থালার ঢাকনি উঠাইতে গেল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে—থাক এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্চি।

অপু হাসিয়া বলিল, ছুঁস নে ছুঁস নে কেন? কেন? আমি বুঝি মুচি? ব্রাহ্মণকে বুঝি অমনি বলতে আছে? পাপ হয় না?

—যা হয় হবে। ভারি আমার বামুন, সন্ধ্যে নেই, আহ্নিক নেই, বাচবিচের জ্ঞান নেই, এঁটো জ্ঞান নেই—ভারি আমার—

খানিকটা পরে সর্বজয়া স্নান সারিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল, আমার পাতে বসিস্ এখন। অপু মুখে হাসি টিপিয়া বলিল, আমি কারুর পাতে বসচি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর এঁটো।

সর্বজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সুর নিচু করিয়া বলিল, আজ এক জায়গায় একটা চাকরির কথা বলচে মা একজন। ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, গাড়ি যখন এসে লাগবে—লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রী করতে হবে। পাঁচ টাকা মাইনে আর জলখাবার। ইস্কুলে পড়তে পড়তেও হবে। একজন বলছিল।

ছেলে যে চাকুরির কথা একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায় সর্বজয়া একথা জানে। চাকুরি হইলে সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপুর মুখে চাকুরির কথা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। সে তো এমন কিছু বড় হয় নাই। তাহা ছাড়া রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে। শহর-বাজার জায়গা, পথে-ঘাটে, গাড়ি-ঘোড়া— কত বিপদ! অত বিপদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজী নয়।

সর্বজয়া কথাটা তেমন গায়ে মাখিল না। ছেলেকে বলিল, আয় বোস্ পাতে—হয়েচে আমার। আয়—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল, বেশ ভাল হয়, না মা? পাঁচ টাকা ক'রে মাইনে। তুমি জমিও। তারপর মাইনে বাড়াবো বলচে। আমার বন্ধু সতীনদের বাড়ির পাশে খোলার ঘর ভাড়া আছে দু'টাকা মাসে। সেখানে আমরা যাবো—এদের বাড়ি তোমার যা খাটুনি! ইস্কুল থেকে অমনি চলে যাবে ইস্টিশানে—খাবার সেখানেই খাবো। কেমন তো?

সর্বজয়া বলিল—রুটি ক'রে দেবো, বেঁধে নিয়ে যাস্।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। আর কোন কথাবার্তা কোনো পক্ষেই উঠিল না। তাহার পর বড়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন-পনেরো কাটিল। বাড়িতে সকলের মুখে, ঝি-চাকর-দারোয়ানদের মুখে বড়বাবুর অসুখের বিভিন্ন অবস্থার কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়বাবু সামলাইয়া উঠিবার দিন কয়েক পর একদিন অপু আসিয়া হাসি-হাসি মুখে মাকে বলিল, আজ মা বুঝলে, একটা ঘুড়ির দোকানে বলেচে যদি আমি ব'সে ব'সে ঘুড়ি জুড়ে দি আঠা দিয়ে, তারা সাত টাকা ক'রে মাইনে আর রোজ দু'খানা করে ঘুড়ি দেবে। মস্ত ঘুড়ির দোকান, ঘুড়ি তৈরি ক'রে কলকাতায় চালান দেয়—সোমবার যেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি এ সব জিনিস সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন, দীর্ঘ পনেরো-ষোলো বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরনের কথা সে শুনিয়াছে। এই সুর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে। এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এইবার ঘটিল, অল্পই দেরি। নিশ্চিন্দিপুরের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।

চারি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহার মধ্যে। কিন্তু সর্বজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিয়া কিছু নাই, অথচ নারীর

অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতরে ভিতরে তাহাকে পীড়া দেয়। অবলম্বন যতই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর হউক, মন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যায়, নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

সে বলিল, তা যাস না সোমবারে! বেশ তো—দেখে অসিস। হ্যাঁ শুনিস নি, মেজ বৌরাণী যে শীগ্‌গির আসচেন, আজ শুনেছিলাম রান্না-বাড়িতে—

অপুর চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কবে মা, কবে?

—এই মাসের মধ্যেই আসবেন। বড়বাবুর শরীর খারাপ, কাজ-টাজ দেখতে পারেন না, তাই মেজবাবু এসে থাকবেন দিন-কতক।

লীলা আসিবে কি-না একথা দুই-দুইবার মাকে বলি বলি করিয়াও কি জানি কেন সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, তাদের বাড়িতে সবাই আসচে, মা বাবা আসচে, আর সে কি সেখানে পড়ে থাকবে? সে-ও আসবে—ঠিক আসবে।

পরদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেচে, দেখাচ্চি।

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়িতে তাহারা আসিয়াছে, কই কেহ তো একখানা পোস্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে।

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে! খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা! সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বললি, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে।

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দিপুরে দেখেচিস!—সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি।

—জানি না, দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আব কোনও —

—আপন নয়, দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড় একটা থাকতেন না, কাশী-গয়া, ঠাকুর-দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান। ওঁদের দেশ হচ্চে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখেন থেকে ক্রোশ দুই—সেবার

আড়ংঘাটায় যুগল দেখতে গিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়ে ছিলাম দু'দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে—ছেলেপিলে কারুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লিখেচেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেচেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বলি গড়াই—ক্ষেমিঝি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখেচেন শীগ্‌গির। দ্যাখ্ দিকি, কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখেনে একদণ্ড ভাল লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্না-বাড়ি ঢোকো, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে! বড়লোকের বাড়ির এ রাঁধুনীবৃত্তি, এ ছন্নছাড়া জীবন-যাত্রায় কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে।

তাহার পর দু'জনে মিলিয়া নানাকথাবার্তা চলিল। জ্যাঠামশায় কি রকম লোক, সেখানে যাওয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা, উঠিবার সময় অপু বলিল—শেঠেদের বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটু পরে। দেখে আসবো মা?

—সকাল সকাল ফিরবি, যেন ফটক বন্ধ ক'রে দেয় না, দেখিস—

পথে যাইতে যাইতে খুশিতে তাহার গা কেমন করিতে লাগিল। মন যেন শোলার মত হাল্‌কা। মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি! কিন্তু লীলা যে আসিতেছে? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবলই লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো? হয়ত এখন বড় হইয়াছে, হয়ত আর তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আরম্ভ হইতে অনেক দেরি হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক রাত্রে যখন আসর ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল, এত রাত্রে বাড়ি ঢোকা যাইবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়লোকদের বাড়ির দারোয়ানেরা কেহ তাহার জন্য গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয়ও হইল। রাত্রিতে এ রকম একা সে বাড়ির বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে থাকে? মা-ই বা কি বলিবে!

আসরের সব লোক চলিয়া গেল। আসরের কোণে একটা পান-লেমনেডের দোকানে তখনও বেচা-কেনা চলিতেছে। সেখানে একটা কাঠের বক্সের উপর সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না, ঘুম ভাঙিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

সে একটু বেলা করিয়া বাড়ি ফিরিল। ফটকের কাছে বাড়ির গাড়ি দুইখানি তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেউড়িতে ঢুকিয়া খানিকটা আসিয়া দেখিল বাড়ির তিন-চার